টানা বৃষ্টিতে শুধু ঢাকা নয় নিউ ইয়র্ক শহরও ডুবে

একটানা বৃষ্টিতে শুধু রাজধানী ঢাকা ডুবে না, দাদাগিরি দেখানো যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নিউ ইয়র্কও ডুবে যায়। শুক্রবার ভারী বর্ষণে নিউ ইয়র্ক শহরের অনেক সাবওয়ে, রাস্তাঘাট ও প্রধান সড়ক পানিতে ডুবে গেছে। সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

গত ২১ সেপ্টেম্বর রাতে ২৩ মিলিমিটার বৃষ্টিতে রাজধানী ঢাকার বহু এলাকা পানিতে ডুবে যায়। সড়ক পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় রাস্তায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। এতে কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন “এই হলো উন্নয়নের চিত্র”। অথচ অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে শুধু ঢাকাই নয়, বহু দেশের রাজধানীও ডুবে যায়। সে কথা ভুলে যায় তথাকথিত সরকারের সমালোচকরা।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। এতেই শহরের অনেক সাবওয়ে, রাস্তাঘাট ও প্রধান সড়ক পানিতে ডুবে গেছে। এ কারণে লাগার্দিয়া বিমানবন্দরের অন্তত একটি টার্মিনাল শুক্রবার বন্ধ রাখা হয়েছে। খবর বিবিসির।

নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোচুল জানান, অনেক জায়গায় পাঁচ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি হয়েছে, কোথাও কোথাও সাত ইঞ্চির বেশিও বৃষ্টি হয়েছে। এতে বিপদ বেড়েছে। তিনি জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে ও ডুবে যাওয়া সড়কে ভ্রমণ না করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

এ পর্যন্ত বন্যায় কারো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে নগর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্যাকবলিত বেসমেন্টে আটকে পড়া বাসিন্দাদের অন্তত ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

কেউ যদি অন্যায় করে আমাদের

দেশে তার বিচার হয়

বাংলাদেশের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন সংস্থা, সেটা র্যাব হোক, পুলিশ হোক বা অন্য যে কোনও সংস্থা হোক; তারা অন্যায় করলে আমাদের দেশে সেটার বিচার হয়। কেউ যদি কোনও অন্যায় করে, আমাদের দেশে তার বিচার হয়। এই বিচারে কেউ রেহাই পায় না। অনেক সময় তারা কোনও কাজ অতিরিক্ত করে, করতে পারে। কিন্তু করলে সেটা আমাদের দেশের আইনেই সেটার বিচার হচ্ছে। যেখানে এমন বিচার হচ্ছে, এমন ব্যবস্থা আছে; সেখানে এই স্যাংশনে কী কারণে?’

যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটন ডিসি ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। শনিবার এই সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

সাক্ষাৎকারে ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক শতরূপা বড়ুয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার জবাবে বলেন, ‘আমার এটাই প্রশ্ন— কথা নেই, বার্তা নেই; হঠাৎ ভিসা স্যাংশন দিতে চাচ্ছে কী কারণে? আর মানবাধিকারের কথা যদি বলে বা ভোটের অধিকারের কথা যদি বলে… আমরা, আওয়ামী লীগ; আমরাইতো এদেশের মানুষের ভোটের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করেছি। আমাদের কত মানুষ রক্ত দিয়েছে, এই ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য।’

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যেন হয়, তার জন্য যতরকম সংস্কার দরকার, সেটা আওয়ামী লীগ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আজ ছবিসহ ভোটার তালিকা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, মানুষকে ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা…। ‘আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দিবো’— এই স্লোগানও আমার দেওয়া। আমি এভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছি। কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ সময় স্বৈরশাসকরা দেশ শাসন করেছে। তাদের সময় সাধারণ মানুষের ভোট দিতে হয়নি। তারা ভোটের বাক্স ভরে নিয়ে ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছেন। এরই প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন, সংগ্রাম করে আজ আমরা নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন মানুষ তার ভোটের অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন। সেটা আমরা করেছি।’

২০০৯ এ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, জাতীয় কিংবা স্থানীয় সরকার নির্বাচন; প্রত্যেকটা সুষ্ঠুভাবে হয়েছে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এসব নির্বাচনে মানুষ তার ভোট দিয়েছে স্বতস্ফূর্তভাবে। এই নির্বাচনগুলো নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাস্তবতাটা কী, বাংলাদেশের মানুষ তার ভোটের অধিকার নিয়ে সবসময় সচেতন। কেউ ভোট চুরি করলে তাদের ক্ষমতায় থাকতে দেয় না।’

উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ভোট চুরি করেছিলেন। সে কিন্তু দেড় মাসও টিকতে পারেনি। ওই বছরের ৩০ মার্চ তাকে জনগণের রুদ্র রোষে পড়ে পদত্যাগ বাধ্য হয়েছেন তিনি। আবার ২০০৬ সালে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার তালিকা করেছিল। সেই ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন করে সে যখন সরকার গঠনের ঘোষণা দিলো… এরপর জরুরি অবস্থা জারি করা হলো। সেই নির্বাচন বাতিল হয়ে গেলো। কাজেই আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু এখন ভোট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। কাজেই একটা নির্বাচন অবস্থা, সুষ্ঠু হবে— এটা তো আমাদেরই দাবি ছিল। এবং আন্দোলন করে আমরাই সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছি। তো আজ তারা স্যাংশন দিচ্ছে, আরও দেবে; দিতে পারে। এটা তাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের যে অধিকার; তাদের ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারসহ সব মৌলিক অধিকার আমরা নিশ্চিত করেছি।

‘রাজনৈতিক মামলায়’ সাজাপ্রাপ্ত প্রধান বিরোধী দলের অসুস্থ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমোদন দেওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ জন্য তাকে তার সাজা বর্তমানে স্থগিত করে বাড়িতে থাকার ও দেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমোদন যে এক সরকারি আদেশে বর্তমানে কার্যকর রয়েছে তা বাতিল করে, জেলে গিয়ে আদালতের কাছে আবেদন করতে হবে।

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল, বাংলাদেশ কিন্তু বদলে যাওয়া বাংলাদেশ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এখন আর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ নেই, এখন মানুষের সেরকম হাহাকার নেই, এমনকি আমাদের যে বেকারত্ব সেটাও কিন্তু কমিয়ে এখন মাত্র তিন শতাংশ। সেটাও তারা কাজ করে খেতে পারেন।’
প্রধানমন্ত্রী আরও দাবি করেন, বাংলাদেশেই এখন অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাই ভিসা স্যাংশন এর ফলে যদি (বাংলাদেশিরা) আমেরিকায় আসতে না পারে, আসবে না। তাতে কিছু যায় আসে না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিস, আমেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ দেশি বিদেশি মানবাধিকার সংগঠনগুলো তার সরকারের আমলে গত ১৫ বছরে গুমের ঘটনার যে অভিযোগগুলো করেছে, সে ব্যাপারে তার সরকারের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকারে তিনি সদ্য পাস হওয়া সাইবার নিরাপত্তা আইনের যে ধারাগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তারও জবাব দেন।

৩৫ মিনিটের এ সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে আগামী জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার জন্য বিরোধীদলগুলোর দাবিকে নাকচ করে দিয়ে বলেন, এ ব্যবস্থায় ফেরত যাবার কোনও সুযোগ নেই।

বিরোধীদলগুলোর বিশেষ করে প্রধান বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে লাখ লাখ মামলা দায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অপরাধ করলে মামলা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় আবার সীমান্ত হত্যা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর-মুন্সিপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে রবিউল ইসলাম (৪১) নামে এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। নিহত রবিউল দামুরহুদা উপজেলার পীরপুরকুল্লা গ্রামের মৃত ফয়জুল ইসলামের ছেলে। এ নিয়ে ২ সপ্তাহের ব্যবধানে দুইটি সীমান্ত হত্যার ঘটনা ঘটলো।

বুধবার ২৭ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার দিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর-মুন্সিপুর সীমান্তের ৯০/৯১ পিলারের মাঝামাঝি স্থানে তিনি গুলিবিদ্ধ হন।

বিজিবি’র মুন্সিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিএসএফের গুলিতে রবিউল নিহত হন। এ বিষয়ে পতাকা বৈঠকের জন্য

বিএসএফের কাছে সকালে পত্র পাঠানো হয়। পত্র পেয়ে বিএসএফ বৃহস্পতিবার দুপুর একটা ২০ মিনিটের সময় ঠাকুরপুর সীমান্তে ৯১ মেইন পিলারের সন্নিকটে বিজিবি-বিএসএফ এক পতাকা বৈঠকে মিলিত হয়। পতাকা বৈঠকে বিএসএফ রবিউলের নিহতর কথা শিকার করে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষ হলে রবিউলের মরদেহ ফেরত দেওয়া হবে।’

এর আগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরের বেনীপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মিজানুর রহমান (৫০) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হন।

কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর কেউ নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না

বাংলাদেশের নির্বাচন ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ করার লক্ষ্যে কেউ যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির আওতায় ফেলেছে বাংলাদেশকে। যদি এমন কেউ ভিসার জন্য আবেদন করে যিনি বাংলাদেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্থ করতে চায় বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনি ভিসা নাও পেতে পারেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভালোর জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে। তবে একথা না বলে উপায় থাকে না যে-যুক্তরাষ্ট্র অন্যদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন আমার জানা নেই। তারা যেকোন সিদ্ধান্ত নেয় নিজের স্বার্থ রক্ষায়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের অন্যতম একটি অস্ত্র হলো ‘স্যাংশন’। যেকোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন দেশকে শাস্তি দিতে হলে, বা যুক্তরাষ্ট্র কাউকে শাস্তি দেবে মনে করলে তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন হলো, এইটা কোন রাষ্ট্র কখন পারে? বা আদৌ তারা কীভাবে পারে? একক কোন দেশ, অন্য কোন সার্বভৌম দেশের ওপর স্যাংশন দেয়া আইনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে। তথাকথিত চিন্তা হলো- বিশ্বের সব দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে একটি সংস্থা কাজ করে। সেটি হলো জাতিসংঘ। তাকে পাশ কাটিয়ে কোন একটা দেশ অপর

দেশের ওপর যখন তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায়, তখন সে তার অস্ত্র হিসেবে স্যাংশনকে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র যখন সেই সিদ্ধান্ত নিতে চায় তখন সে খেয়াল করে ওই দেশের সঙ্গে মেজরিটি কান্ট্রি আছে কিনা? সেসব বিচার করে আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি মনে করি, বর্তমানে স্যংশনের নামে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আসলে জনগনকে শাস্তি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আপনি স্যাংশন আরোপের কথা বলছেন বা বাস্তবায়ন করছেন ঠিকই, কিন্তু আসলে সেটা যখন করছেন তখন এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কস্ট দেওয়া হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের মানুষের কস্টে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আর এই দেশের মানুষের এও জানা আছে যে, ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো তা আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমেরিকা আসলে কেন এমন পরিস্থিতি তৈরী করলো? এবার একটু পিছনের দিকে ফিরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে তারা বাংলাদেশের পক্ষ নেয়নি। শুধু তাই নয়, একটি যুদ্ধোত্তর দেশকে সামনে এগোতে নানা বাধা সৃষ্টি করেছিল। নিজের স্বাধীন দেশের জন্যে, বঙ্গবন্ধু যখন কিউবাতে গিয়ে তাঁর চটের বস্তা নিয়ে কাজ করতে চাইলেন তখন আমেরিকা বাধ সেধেছিলো। সেসময় তারা খাদ্য অনুদান দিতো, সেটি বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশে চরম খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় খাদ্য সংকটে পড়েছিলো এই দেশ। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছিল শ্রমজীবী মানুষ। লেখার শুরুতে যেটা বলছিলাম, আসলে শাস্তিটা পায় সাধারণ মানুষ।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভেনেজুয়েলাতে তাদের স্যাংশনের কারণে ৪০ হাজার শিশু মারা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর একক সিদ্ধান্তে মারা গেলো ৪০ হাজার শিশু! এমন পরিস্থিতি যখন শুধু একটি দেশের ইচ্ছায় হয়, তখন কোন সম্মিলিত বিশ্বব্যবস্থা তা মানতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে এই স্যাংশন অস্ত্র যেভাবে কাজে লাগাতে চাইছে, সেটা আগামীদিনে কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে আমার শঙ্কা রয়েছে। কারণ স্যাংশনে পড়া অনেক দেশ সেটা ভেঙে ফেলতে চাইছে। যেমন ধরা যাক, ইউক্রেনের জন্য রাশিয়াকে যে স্যংশন তারা দিয়েছে, তা কি রাশিয়া মানছে? কিংবা ধরা যাক, উগান্ডা কিংবা নাইজেরিয়ার কথা।

ঠিক একইভাবে, বাংলাদেশে তারা এখন অবাধ সুস্ঠু নির্বাচনের কারণ দেখিয়ে স্যংশনের হুমকি দিল। প্রশ্ন হলো, তারা ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’

নির্বাচনের কথা বলছে বটে, কিন্তু অবাধ পরিবেশ তৈরী করছে কি? বরং দেখা যাচ্ছে, যারা আমেরিকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাদের বশে আনার উপায় হিসেবে স্যাংশন দিচ্ছে। তারা কার ওপর হুমকি দেবে, সেটা নিশ্চিত বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেকের ভিসাও যে আমেরিকা দেয়নি সেই উদাহরণও আছে।

আরেকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন হলো, কারা কী করছে যুক্তরাষ্ট্র কোথা থেকে সে তথ্য নিচ্ছে? সেই তথ্য একপেশে, না গ্রহণযোগ্য সেই বিবেচনা কে করবে? একজন তথাকথিত মানবাধিকারকর্মী আদিদুলের আইনের পথে বিচার হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাথা ব্যাথার কারণ হয় এবং তার পক্ষে সরব অবস্থান নেয়। কিন্তু সেই লোক যে ৬১ লাশের কথা বলে মিথ্যাচার করলো এবং সেই মিথ্যাচার যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরী করলো, অরাজকতার চেষ্টা হলো, সেটা উল্লেখ না করে, বিবেচনায় না নিয়ে, প্রকারন্তরে সমর্থন দিলো! সেই বিষয়টা অন্ধকারে রেখেই কী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন হবে?

আসলে খোদ যুক্তরাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছে যে এই স্যাংশন নিয়ে রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া ভাল আছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত যে অর্থব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে এধরনের অস্ত্রের ব্যবহার, মার্কিনবিরোধী জোট তৈরীতে সহায়ক হবে। এই বোধ আমেরিকার থাকতে হবে। যদিও এ নিয়ে আমি তাদের উপদেশ দিতে চাই না। শুধু বলতে চাই, একপেশে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার জন্য স্যাংশনের মত কোন উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য না। বাংলাদেশের জন্যে ভিসানীতি ঘোষণার পর দেখা গেছে, একপক্ষ আনন্দ নিয়ে উগ্রীব হয়ে আছে। এতেই বোঝা যায় এটি একটি রাজনীতি বিভাজন প্রক্রিয়া। যে কারণে এক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জেনে খুশি হয়ে যাচ্ছে অন্যপক্ষ।

সেটা কি অবাধ নিরপেক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়ক? এই পরিস্থিতি সংঘাতের কারণ হতে পারে। সেই দায় কে নেবে? ভুলে গেলে চলবে না যে, আরেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কারণে কোন সংঘাত হলে, এর দায় তাদের নিতে হবে। স্যাংশন বিষয়ে ঘোষণা আসার পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আবার সুনির্দিষ্ট করে বলছেন, এরমধ্যে গণমাধ্যমও পড়বে। আবার এরপর স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, গণমাধ্যম পড়বে এমনটা এখনও না। এ ধরনের আলাপ তোলা, কোন রাষ্ট্রদূতের জন্যে কতটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার? এই প্রশ্ন আমরা এখন তুলতেই পারি। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলার এখতিয়ার বিদেশি রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু তারপরেও তারা এটা করছে, কেনো? এক কথায় এর

জবাব হতে পারে, তারা এটা করছে শক্তি দেখানোর জন্যে।

তাদের শক্তি দেখানোর আরও একটি উদাহরণ আছে। সেটা হচ্ছে, পিটার হাস আরও বলেছেন, তারা বাংলাদেশের বিচার বিভাগ পযবেক্ষণ করবে। কী অদ্ভুত! তারা কি জানে না, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন? আপনি বিচারককে কীভাবে পযবেক্ষণ করবেন? তিনিতো কাজ করেন আইনের বিধিতে। বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধানে। আমেরিকার নিয়মে তো চলবে না। পর্যবেক্ষণের মতো বিষয়গুলো সামনে এনে এরা এসব প্রতিষ্ঠানে রিতীমত বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরী করতে চাচ্ছে।

এখন আমাদের অবস্থান কী হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সে অনুযায়ী অ্যাক্ট করা দরকার। সত্যিকথা বলতে, আমেরিকা মনে করে ভারত মহাসাগরে তার অবস্থান শক্ত করতে হলে বাংলাদেশকে তার লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ, পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী সে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার কথা বলে। এখন সেটা ভাঙতে চাইলে বাংলাদেশকে নানারকম চাপ দেয়ার বিকল্প নেই। এখন এই অবস্থা বিবেচনা করে করণীয় ঠিক করাটা বাংলাদেশের জন্যে জরুরি।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

ভিসানীতি: বিএনপিকে নির্বাচনে আসতেই হচ্ছে

লেখাটি শুরু করি ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর নামে বিএনপি-জামায়াত জোট দেশময় তাণ্ডব করেছিল। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে পরের সেই তাণ্ডবে মারা গিয়েছিল ২৩১ জন নিরীহ মানুষ। এদের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬৫জনকে। ওই সময় আহত হয়েছিল ১ হাজার ১৮০ জন। যাদের অনেকে আজও শরীরে ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। সেসময় ২ হাজার ৯০৩টি গাড়ি, ১৮টি ট্রেন ও ৮টি লঞ্চে আগুন দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট।

কারণ কী ছিল সেই সহিংসতার? সরকার বলছিল নির্বাচন হবে পৃথিবীর আর

১০টা গণতান্ত্রিক দেশের মত। আর বিএনপি জোটের দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এখনও সরকারে আছে আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন নিয়ে তাদের দর্শন থেকে সরে আসেনি। তত্ত্ববধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে আসেনি বিএনপি-জামায়াত। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না ঘোষণা দিয়ে সব নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছে তারা।

ঠিক এই মুহূর্তে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জারি করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বরাত দিয়ে তিনি বললেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাধা দেয়ায় বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারও নাম না উল্লেখ করে তিনি বললেন, যাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তারা বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিচারবিভাগের সদস্য এবং নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য।

যাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সেসব ব্যক্তি তা তাদের পরিবারের সদস্যরা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। ভবিষ্যতে আরও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করা বা এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলে তারাও এই নীতির আওতায় আসবেন। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থক।

এর আগে চলতি বছরের ২৫শে মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র। তখন বলা হয়েছিলো যে, এই নীতির আওতায় যে কোন বাংলাদেশি যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে চিহ্নিত হন। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

এই বিধিনিষেধ ঘোষণার পর থেকে নানামুখি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে নানা মতের মানুষ। এই মুহূর্তে আমেরিকা সফররত খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভিসা নীতি নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগেরও চাওয়া। তবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে এ দেশের জনগণ ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও নিষেধাজ্ঞা

দেবে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণায় বিরোধীদের কথাও বলা হয়েছে। এবার বিএনপি জ্বালাও-পোড়াও করতে পারবে না। এতে জনগণের জীবন বাঁচবে।’

ভিসানীতি নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুরু হয়েছে মাত্র। বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়নি। এই সরকার ২০১৪ ও ২০১৮ সালে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, নিজেরা নিজেদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন। এবার ২০২৪ সালে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তারা একইভাবে নির্বাচন করতে চাচ্ছেন। সরকারের লক্ষ্য বিরোধীদলকে বাদ দিয়ে আবারও একটি নির্বাচন করা। বর্তমান সরকার যদি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দেয়, সেই নির্বাচন কখনও সুষ্ঠু হতে পারে না এবং সেটা কখনোই দেশের মানুষ মেনে নেবে না।”

যুক্তরাষ্টের নতুন ভিসা নীতির নিষেধাজ্ঞার তালিকায় কিছু বিরোধী দলের নেতার নাম আছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত ১৮ বছর ধরে বিরোধী দলের তো কোন ভূমিকা নেই, তারা এমন কোন কাজ করেনি, যে কাজের জন্য একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে। যেহেতু বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকার গণতন্ত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা বারবার বলছেন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী হলে গণতন্ত্র সুষ্ঠু হয়? আজকের নিষেধাজ্ঞাদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি কী? তারা কী তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানেন? এখানে আরেক দফায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণায় আসতে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিলে ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন, গত মে মাসের ৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে এই ভিসা নীতি আরোপ করার সিদ্ধান্ত জাননোর পর।

আরেকটু সরল করে যদি জিজ্ঞেস করি কেন ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন কেন অংশগ্রহণমূলক হলো না? এর দায় কী শুধু সরকারের? নির্বাচন করা তো সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেছে। ২০০৮ সালে জনগণ আওয়ামী লীগকে সংবিধান রক্ষার ম্যান্ডেট দিয়েছিল। ভাঙার দায়িত্ব তো দেয়নি। সেই সময় থেকে বিএনপি-জামায়াত গো ধরেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারতো কোন স্বীকৃত নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর কোথাও তো এই পদ্ধতি

জনপ্রিয় হয়নি।

নির্বাচনে বাধা দেয়ার প্রশ্ন যদি ওঠে, সেই কাজটি করেছে বিএনপি-জামায়াত। তারা নির্বাচনে আসেনি। দেশময় জ্বালাও পোড়াও করে মানুষের মধ্যে নির্বাচন ভীতি সৃষ্টি করেছে। যে ভীতি আজও কাজ করে মানুষের মধ্যে। সেসব নিয়ে আজকাল কথা বার্তা কম হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসা উচিত ছিল, কেন বন্ধকী গণতন্ত্র জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল বিএনপি-জামায়াত? কেন তারা সুষ্ঠু গণতেন্ত্রে ফিরতে চায় না? কেন তারা ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টে শেখ হাসিনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল? চক্রটি চেনার পরেও শেখ হাসিনা কী বার বার তাঁকে হত্যার অস্ত্র হত্যাকারীদের হাতে তুলে দেবে?

যাই হোক, আগামী নির্বাচন এবং নতুন ভিসা নীতির কাছে ফিরে আসি। বিএনপি-জামায়াতের প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা কোথাও বলেননি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বার বার বলেছেন, একটি অংশগ্রনমূলক নির্বাচনের কথা। বিএনপি নির্বাচনে আসলেই তো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়। সেটা সুষ্ঠু করার দায়তো সরকারের। সেই প্রতিশ্রুতিতো সরকার বার বার দিচ্ছে। নির্বাচনে কী হবে? সুষ্ঠু হবে কী না সেটা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তো মন্তব্য করা যাবে না। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপরতো একটি সংবিধান বা রাষ্ট্র ভর করতে পারে না। যত শক্তিধরই হোক যুক্তরাষ্ট্রতো বাংলাদেশকে সংবিধান ভাঙার পরামর্শ দিতে পারে না নৈতিকভাবে।

ভিসানীতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। এখন বিএনপির ভয় পাওয়ার কিছু দেখছি না। আসলে ভিসানীতি দিয়ে নির্বাচনের বল বিএনপির কোটে ঠেলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন নির্বাচেনে আসা তাদের দায়িত্ব। এর পরেও যদি তারা না আসে তাহলে ব্লিংকেনের ‘গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দুর্বল’ করার অপরাধে পড়বে বিএনপি। ফখরুল সাহেবরা নিশ্চয়ই আর সেই অপরাধ করবেন না।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

গণমাধ্যমের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে হাসের কথায় ভিন্নমত যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশি গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের কথায় ভিন্নমত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে বাংলাদেশি গণমাধ্যমকর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে জানিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। এরপরই গণমাধ্যম নেতা ও বিশ্লেষকরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আর একদিন পরেই পিটার হাসের বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বা ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট। তারা জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল, বিরোধী দল ও ব্যক্তিত্ব এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর প্রযোজ্য।

গত সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার স্পষ্ট করে বলেন, ‘গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নয়, বরং বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের ওপরই ভিসানীতি কার্যকর হয়েছে।’

গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি চ্যানেলের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, সরকারি দল, বিরোধী দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর আগামীতে গণমাধ্যমও ভিসানীতিতে যুক্ত হবে। পিটার হাসের এই বক্তব্যের দুইদিন আগে শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া যারা বাধাগ্রস্ত করবে তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানায়।

এর আগে, গত ২৪ মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে কেউ গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না। এমনকি তার পরিবারের সদস্যরাও মার্কিন ভিসা থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু গণমাধ্যমের কথা আলাদাভাবে কখনো উল্লেখ করা হয়নি। পিটার হাস হঠাৎ

করে কোন পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যমকে যুক্ত করে বক্তব্য দিলেন সেটি এখন প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি মিডিয়ার বিষয়ে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা হবে দুঃখজন্ক এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ।”বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন, “ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেটা আরেকটি দেশের গণমাধ্যমের ওপর আরোপ করার সুযোগ থাকবে কেনো?“

গত সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বিষয়টি উত্থাপন করেন দেশের এক বেসরকারি টেলিভিশনের ওয়াশিংটন প্রতিনিধি। এ সময় রাষ্ট্রদূত যা বলেছেন, তার সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তিনি বলেন, ভিসা নীতির আওতায় কারা পড়েছেন নির্দিষ্ট করে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে এটি বেশ স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, এর আওতায় পড়বেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা।

বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যই ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানান মিলার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো পক্ষ নেওয়ার জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়নি। বরং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এ ভিসা নীতি।

অর্থের বিনিময়ে তথ্য পাচার করতেন মার্কিন সিনেটর মেনেনডেজ

চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। এই প্রবাদ বাক্যটা আমরা সবাই মুখে মুখে শুনেছি। সেই প্রবাদের প্রতিফলন দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান বব মেনেনডেজের ক্ষেত্রে। যিনি আবারও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র্যাবের বিরুদ্ধে

সামরিক সহায়তা দিতে সিনেটর অনেক অর্থ ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মিশর এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা প্রাপ্ত অন্যতম একটি দেশ। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২০২২ সাল পর্যন্ত বছরে ১ বিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা মিশরকে দিতো।

এদিকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত মেনেনডেজের পদত্যাগ দাবি করেছে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেট পার্টির সদস্যরা। তবে মেনেনডেজ পাল্টা জানিয়েছে, ‘আমি কোথাও যাচ্ছি না’।

দুর্নীতির অভিযোগ আসার পর তিনি সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছেন, ‘আমি সিনেটে থাকছি’।
তিনি আরও বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে, তা শুধু অভিযোগ। আমি স্বীকার করি যে এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় লড়াই হবে আমার জন্য’।

এদিকে মিশরে সামরিক সহায়তা বন্ধে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। নিউ ইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা আদালতে বিস্ফোরক অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর শুক্রবার সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির প্রধানের পদ থেকে সাময়িকভাবে পদত্যাগ করেন মেনেনডেজ।

ওয়াশিংটনভিত্তিক সংগঠন ফ্রিডম ইনিশিয়েটিভ বলেছে, নিজেকে বিত্তবান করার জন্য মেনেনডেজ মিশরের দুর্নীতিগ্রস্ত, নৃশংস সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে তার অবস্থান ব্যবহার করেছেন।

গণমাধ্যমে মার্কিন ভিসানীতি: রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের পর সাংবাদিক নেতাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এটিকে

গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপও বলছেন তারা। একই সাথে পিটার হাসের বক্তব্য প্রত্যাহারেরও দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। যদিও ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের ঘোষণার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, “স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর নিষেজ্ঞার আরোপের কথা পিটার হাস এভাবে বলতে পারেন না। কার বাংলাদেশ স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ। ভিসা নীতি আরোপ করলে সাংবাদিক সমাজে অস্বস্তি সৃষ্টি হবে। যেসব সাংবাদিকদের সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে তারা মত প্রকাশে দ্বিধান্বিত বোধ করবেন।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, “গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে কী গণতন্ত্র নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব? বাংলাদেশের ইতিহাসে খারাপ নজির সৃষ্টি করেছেন পিটার হাস। গণমাধ্যম পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করেছেন তিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতাকারীরা যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে যা খুবই দুঃখজনক।”

ঢাকা ডিপ্লোমেট ডট কম এবং সংবাদ সারাবেলার সম্পদক আব্দুল মজিদ বলেন, “সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যাদের ভুমিকা রয়েছে, যেমন আইন শৃঙখলা ররক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি দল ও বিরোধী দল এবং গণমাধ্যম, ভিসানীতির নামে তাদেরকেই হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমত, একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া নিয়ে অযাচিত কথা বলে এক ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা অগ্রহণযোগ্য। ভিসানীতি কার্যকরের ঘোষণায় মূলত তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে না।”

সিলেটের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও দৈনিক উত্তরপূর্ব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক তাপস দাশ পুরকায়স্থ বলেন, “কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করবে ওয়াশিংটন। নিষেধাজ্ঞায় না থাকা বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা কূটনীতিক সৃষ্টাচার বর্হিভূত কাজ। আর গণমাধ্যমকে ভিসানীতির আওতায় আনলে গণতন্ত্র বিকশিত নয়, নিয়ন্ত্রিত হবে।”

গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি চ্যানেলের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস

বলেন, সরকারি দল, বিরোধী দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর আগামীতে গণমাধ্যমও ভিসানীতিতে যুক্ত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভীতি ব্রিকস সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী চীনা বলয়

গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলোর কূটনীতির প্রিয় কৌশল হলো ‘নিষেধাজ্ঞা দেওয়া’। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৯ হাজার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কিছু খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ওই বছরই বাইডেন প্রশাসন বিশ্বব্যাপী আরও ৭৬৫টি নতুন নিষেধাজ্ঞা দেয়। বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনোভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যে দেশগুলো পড়েছে, বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক ইনডেক্সে দেখা যায়, বৈশ্বিক উৎপাদনে তাদের অবদান প্রায় এক–পঞ্চমাংশ। এই উৎপাদনের ৮০ ভাগের দাবিদার আবার চীন।

সাধারণত দেখা যায়, নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশগুলো নিজেদের বড়ো ধরনের ক্ষতি ছাড়াই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে। কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মস্কোর ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তা এই সূত্র মানছে না। দীর্ঘ সময় ধরে রাশিয়া থেকে আমদানিকৃত সস্তা জ্বালানি দিয়ে ইউরোপের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিকল্প হিসেবে এখন তারা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি শুরু করেছে, যার মূল্য পাইপলাইন গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশি।

ফলে ইউরোপের আর্থিক বাজারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ হুমকির মুখে পড়েছে। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো নতুন করে ভাববে। যুক্তরাষ্ট্র যে সকল দেশের ওপর

নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করছে, ধীরে ধীরে সে সব দেশ চীন বলয়ে আসতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত দেশগুলোকে চীন বাণিজ্যিক সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দিয়ে নিজেদের কাছে টেনে নিচ্ছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রীক বলয়ের প্রভাব যেমন কমছে, পাশাপাশি চিনা বলয় শক্তিশালী হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কেন বারবার এই ভিসানীতির ভয় দেখায়। এর মূল কারণ যুক্তরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বিভিন্ন দেশ আলাদা বলয় শক্তিশালী করছে। এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ৪০টি দেশ ব্রিকসে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পাওয়া দেশগুলোও রয়েছে।

এবিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান বলেন, ‘২০১৫ সালে ব্রিকসের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি) গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়ে উন্নয়ন অর্থায়নের উপর বিকল্পভাবে নিয়ন্ত্রণ আনা। জোটটি ‘ব্রিকস পে’ তৈরিতে কাজ করছে, যার মাধ্যমে নিজস্ব মুদ্রা ডলারে রূপান্তর না করেই ব্রিকসের মধ্যে অর্থ লেনদেন করা যাবে। লেনদেনে ব্রিকস ডলারের বিকল্প হিসেবে নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা চালু করলে একদিনেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ধস নামিয়ে দেবে।’

সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ জানান, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নামে পরিচিত। এ অঞ্চলটি বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ৬০ ভাগের অংশীদার। বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দুই তৃতীয়াংশ অবদান এই অঞ্চলের। এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে; রয়েছে জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও বাংলাদেশের মতো ডজনখানেক দেশ। ইন্দো- প্যাসিফিক অঞ্চলে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর পাশাপাশি রয়েছে অনেক উঠতি অর্থনৈতিক পরাশক্তির দেশ। একের পর এক নিষাধাজ্ঞার কবলে পরে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের অনেক দেশ এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে; ফলে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে দিন দিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে লড়েছে মার্কিন গণমাধ্যম

সাবেক স্টেট সেক্রেটারি ও ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে ২০১৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার নির্বাচনে মার্কিন গণমাধ্যম বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেকেরই ধারনা ছিল ট্রাম্প জয়লাভ করবেন না, জনপ্রিয়তার দিক থেকে হিলারি ছিলেন এগিয়ে। বলা হয়, ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া বিতর্কিত ভুমিকা পালন করেছে। অতীতে কখনই মিডিয়ার এমন অবস্থান কেউ দেখেননি। কারণ অনেক মার্কিন পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেল প্রকাশ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নেয়। আর হিলারিকে একজন ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরে, যা মার্কিন গণমাধ্যমের সুষ্ঠু নির্বাচনকেন্দ্রিক নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিন্ধ করে।

শুধু তাই নয়, একদিকে ট্রাম্পের প্রশংসা এবং অন্যদিকে হিলারি ক্লিনটনের ত্রুটি ধরে তুলতে ব্যস্ত ছিল মার্কিন গণমাধ্যম। এই অবস্থানই মার্কিন জনগণের কাছে বিতর্ক তৈরি করে নির্বাচন নিয়ে। মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর অনেকেই সেদেশের গণমাধ্যমকে ট্রাম্পের উত্থানের জন্য দায়ী করেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে ‘ঐতিহ্যগত’ ভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে গণমাধ্যম প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬০ সালের নির্বাচন থেকে এই প্রথা প্রচলিত। কারণ প্রার্থীর খবর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ গণমাধ্যম থেকেই বেশি পেয়ে থাকে। একজন প্রার্থীর বিষয়ে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কতটুকু করা হচ্ছে এবং কী উপায়ে করা হচ্ছে তার প্রতি নাগরিকদের আলাদা দৃষ্টি থাকে। আর সেই দৃষ্টি থেকেই মার্কিন গণমাধ্যমের এই বিতর্কিত অবস্থান সবার নজরে আসে।

অন্যদিকে হিলারির পক্ষে যে গণমাধ্যমের অবস্থান ছিল না এমনটিও নয়।

রিপাবলিকানদের মধ্যে অবিশ্বাসের চেয়ে বেশি আস্থা তৈরি করে, এর মধ্যে আছে ফক্স নিউজ এবং হোস্ট শন হ্যানিটি এবং রাশ লিম্বোগের টক রেডিও প্রোগ্রাম।

ডেমোক্র্যাটদের জন্য, সংখ্যাটি প্রায় বিপরীত। ৩০টি উৎসের মধ্যে ২২টিতে অবিশ্বাস প্রকাশের চেয়ে ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশ আস্থা প্রকাশ করে। ফক্স নিউজ, শন হ্যানিটি এবং রাশ লিমবাগসহ মাত্র আটটি অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

২০২০ সালে বাইডেন জয়লাভের পর প্রিন্স অব লিচেনস্টাইন মাইকেল এক নিবন্ধে বলেছেন, নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গণমাধ্যম, যারা পেশাদার রিপোর্টিং এবং সম্পাদনার চেয়ে তাদের মতামত এবং স্ব-সংজ্ঞায়িত ‘নৈতিকতা’ প্রচার করতে বেশি আগ্রহী ছিল। নির্বাচনের পরেও সাংবাদিকতার মানদণ্ডের এই বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ হবে না এবং এটি আরও প্রতিফলিত হবে।

তার মতে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া স্পষ্টতই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পোস্টের দৃশ্যমানতা সীমিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সম্প্রচার মাধ্যম এবিসি, সিবিএস, সিএনবিসি এবং এমএসএনবিসি ট্রাম্পের ভাষণে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, যিনি প্রায় অর্ধেক ভোট পেয়েছিলেন, তাকেও বাঁধা দেওয়া হয়েছিল এবং সম্প্রচারটি তার বক্তব্যকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। সিএনবিসির মডারেটর বলেন, ‘আমরা এতে বাধা দিচ্ছি, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা অনেকটাই অসত্য’।

তিনি মনে করেন, এটি করার মাধ্যমে, মিডিয়া আমেরিকান জনগণকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের দেওয়া ভাষণ থেকে বঞ্চিত করেছিল। কেউ ট্রাম্পের সাথে একমত হোক বা না হোক, মার্কিন নাগরিকদের তাদের রাষ্ট্রপতি কী বলেছেন তা শোনার অধিকার রয়েছে। মিডিয়ার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে- ‘ডেনমার্ক রাজ্যে কিছু পচে গেছে’।